তারিখ ... 27 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা

উচ্চশিক্ষা | ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী

অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

একটি দেশের প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে আগামী দিনের সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আর প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে গবেষণার বিষয়টি নিবিড়ভাবে জড়িত। বর্তমানে বাংলাদেশে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা অনেকটা তাত্ত্বিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গবেষণার মৌলিক ও প্রায়োগিক দিকটি বিবেচনায় আনা হয় না। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রতিটি গবেষণা প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিকের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের সংস্কৃতি এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হলো, শিল্প কারখানাগুলোর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংক্রান্ত কোনো ধরনের সম্পর্ক এখনও পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়নি। এখানে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো, বাংলাদেশের শিল্প কারখানাগুলোর গবেষণার প্রতি এক ধরনের উদাসীনতা। কারণ শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের ধারণা, এ ধরনের উদ্যোগের ফলে বিপুল অর্থ ব্যয় হতে পারে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মধ্যেও শিল্প কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করার মানসিকতা এখন পর্যন্ত তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প কারখানার মধ্যে একত্রে কাজ করার সেতুবন্ধ গড়ে তোলা দরকার। আর এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও শিল্প কারখানার মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়ের প্রয়োজন। বাইরের দেশগুলোতে সরকার গবেষণার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে, তা আমাদের দেশের গবেষকদের ক্ষেত্রে করা হয় না। বিদেশের অধ্যাপকরা বাংলাদেশের মেধাসম্পন্ন মানুষদের মেধাশক্তি ব্যবহার করে গবেষণালব্ধ ফলাফল উচ্চমূল্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানার কাছে বিক্রি করেন। এ ছাড়া প্যাটেন্ট ও বিশ্বমানের জার্নালের গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ করেন। আবার গবেষণাপত্র প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে তাদের অবদানের জন্য আর্থিকভাবে ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের মৌলিক গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারেও ভূষিত হন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের গবেষণার সেই পরিবেশ তৈরি করা যায়নি। ফলে যেখানে একজন অধ্যাপকের শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ভাবার কথা ছিল, তা বাস্তবে হচ্ছে না। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধ্যাপক হওয়ার পর একজন শিক্ষক তার গবেষণাকর্ম বন্ধ করে দেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সর্বোচ্চ পদ। যেহেতু তিনি অধ্যাপক হয়ে গিয়েছেন, আর কোনো গবেষণার প্রয়োজন নেই– এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক ধারণা তার মধ্যে তৈরি হয়। কারণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাত্ত্বিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান যদি গড়ে না ওঠে, তবে সেই শিক্ষক কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাদানে ব্যর্থ হবেন।

ফলে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে যে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, তারা যেভাবে নিজেদের গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা কখনোই বাস্তবে পূর্ণতা লাভ করেনি। এ জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। এই হতাশা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে শিক্ষার্থীরা স্বল্প পরিসরে হলেও রোবটিক্স, সফটওয়্যার বানানো ও নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করছে। তবে এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রকৃত চিন্তাধারার সাহায্য যদি তারা পেত, তবে সেটি হয়তো বিশ্বমানের মৌলিক ও ফলিত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখত। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সমন্বয়হীনতা কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুব গভীরভাবে ভেবে দেখা যেতে পারে। সেটি হলো, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটিমাত্র উপাচার্যের পদ থাকে। আবার উপাচার্য পদ পাওয়ার ক্ষেত্রেও এক ধরনের বিকৃত প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলে একজন শিক্ষক যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় সব বিষয় তাকে দেখতে হয়। বিশেষ করে প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে একজন উপাচার্যের চার বছরের সময়কাল চলে যায়। এখানে সরকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দু'জন উপাচার্যের কথা ভাবতে পারে। এদের মধ্যে একজন উপাচার্য প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়গুলো দেখবেন আর একজন উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক কার্যক্রমকে পরিচালনা করবেন। তবে এতে যাতে দ্বৈতধারার শাসনব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য সরকারকে সুস্পষ্টভাবে দু'জন উপাচার্যের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

> বর্তমানে বাংলাদেশে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা অনেকটা তাত্ত্বিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গবেষণার মৌলিক ও প্রায়োগিক দিকটি বিবেচনায় আনা হয় না। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রতিটি গবেষণা প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিকের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের সংস্কৃতি এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হলো, শিল্প কারখানাগুলোর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংক্রান্ত কোনো ধরনের সম্পর্ক এখনও পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়নি

আর এটা যদি বাস্তবে কার্যকরভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক কার্যক্রমকে পরিচালনা করার জন্য যে শিক্ষক উপাচার্য হিসেবে নিয়োজিত হবেন, তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদন করবেন। এই চুক্তি যথাযথভাবে কাজ করছে কি-না এবং সেটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষতা সাধনে অবদান রাখছে কি-না এ বিষয়গুলো তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। দেশ-বিদেশের শিল্পকারখানার সঙ্গে তিনি শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে চুক্তি করার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেবেন। এখানে যে বিষয়টি তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হলো শিল্প কারখানাগুলো তাদের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জানাবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তা সমাধান করে দেবেন। এর বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প কারখানাগুলোর কাছ থেকে গবেষণার জন্য অর্থ পাবে আর শিল্প কারখানা তার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে পণ্যের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা বাড়াতে সক্ষম হবে। এই উপাচার্যের প্রধান কাজ হবে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার জন্য যৌক্তিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মধ্যে অর্থ ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উপাচার্য বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে কীভাবে ফলিত ও মৌলিক গবেষণাকে সম্প্রসারিত করা যায়, তার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা কার্যক্রমে যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করা। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সেটি হলো, শিক্ষকদের প্রশাসনিকভাবে দায়িত্ব কম প্রদান করা এবং শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাদের বেশি করে সম্পৃক্ত করা। বিদেশে দেখা যায়, কোনো কোনো শিক্ষক শুধু গবেষণা কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। আবার কেউ কেউ শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। এ ধরনের গবেষণামুখী ও শিক্ষামুখী অথবা দুইধারার সম্মিলনে শিক্ষকদের শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে। আরেকটি বিষয় না বললেই নয় সেটি হলো, গবেষণাপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি জার্নালের একটি নীতি আছে। সেই নীতিগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নতুবা তা নীতি পরিপন্থী হবে। এর প্রভাব যে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের জন্য বিরূপ হতে পারে এ সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। যদিও আগে প্রবন্ধ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়নি। যদি দেখা যায় কারও প্রবন্ধের ২০ পার্সেন্টের বেশি লেখা মিলে যায়, তবে তা নীতিহীন কাজ বলে গণ্য হবে এবং গবেষণাপত্রটি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। গবেষণা ছাড়া শিক্ষা অর্থহীন, এই দায়িত্ব অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

asadzmn2014@yahoo.com

প্রকৌশলী
পরিচালক
পরিদর্শন বিভাগ
ডিএ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর
তারিখ ...
প্রাপ্তি নং ...